হাইড্রোলিক ভেঁপু শহরের জনপূর্ণ সড়কে চলমান নারী-পুরুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়।

ঢাকা শহরের শব্দ দূষণ এভাবেই প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার শিশুর শ্রবণ ক্ষমতাকে ধ্বংস করছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, যদি তিন বছরের কম বয়স্ক শিশু কাছাকাছি দূরত্ব থেকে ১০০ ডিবি মাত্রার শব্দ শোনে, তাহলে সে তার শ্রবণ ক্ষমতা হারাতে পারে। শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য উপাদানগুলো হলো বেতার, টেলিভিশন, ক্যাসেট প্লেয়ার ও মাইক্রোফোনের উচ্চ শব্দ; কলকারখানার শব্দ এবং উচ্চ মাত্রার চিৎকার, হইচই, গোলমাল। শব্দ স্পন্দনের একক হল হার্টজ। মানুষ সাধারণত ১৫ থেকে ২০ কিলোহার্টজ স্পন্দনের শব্দ শোনে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতানুসারে, সাধারণত ৬০ ডিবি শব্দ একজন মানুষকে সাময়িকভাবে বধির করে ফেলতে পারে এবং ১০০ ডিবি শব্দ সম্পূর্ণ বধিরতা সৃষ্টি করতে পারে। সেক্ষেত্রে হিসাব করে দেখা গেছে যে, শহরের যেকোন ব্যস্ত সড়কে সৃষ্ট শব্দের মাত্রা ৬০ থেকে ৮০ ডিবি, যানবাহনের শব্দ মিলে তা ৯৫ ডিবিতে দাঁড়ায়; লাউডস্পিকারের সৃষ্ট শব্দ ৯০ থেকে ১০০ ডিবি, কল-কারখানায় ৮০ থেকে ৯০ ডিবি, রেস্তোরাঁ এবং সিনেমা হলে ৭৫ থেকে ৯০ ডিবি, মেলা-উৎসবে ৮৫ থেকে ৯০ ডিবি, স্কুটার বা মোটরসাইকেলের ৮৭ থেকে ৯২ ডিবি এবং ট্রাক-বাসের সৃষ্ট শব্দ ৯২ থেকে ৯৪ ডিবি। কিন্তু শব্দের বাঞ্ছনীয় মাত্রা হলো: শয়নকক্ষে ২৫ ডিবি, বসবার ও খাবার ঘরে ৪০ ডিবি, কার্যালয়ে ৩৫-৪০ ডিবি, শ্রেণিকক্ষে ৩০-৪০ ডিবি, গ্রন্থাগারে ৩৫-৪০ ডিবি, হাসপাতালে ২০-৩৫ ডিবি, রেস্তোরাঁয় ৪০-৬০ ডিবি এবং রাত্রিকালে শহর এলাকায় ৪৫ ডিবি।

যখন শব্দ এই সীমা অতিক্রম করে তখনই শব্দ দূষণ ঘটে। সীমার বাইরের শব্দ দূষণ শ্রবণ ক্ষমতা ধ্বংস করে, যা কারো মানসিক ভারসাম্যকেও বিনষ্ট করতে পারে। শব্দ দূষণ খিটখিটে মেজাজ সৃষ্টিরও কারণ, এছাড়া এর দ্বারা ফুসফুস আক্রান্ত হয়, শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বাধাগ্রস্ত হয় এবং তাদের লেখাপড়ায় উদাসীন করে তোলে।

১. শব্দদূষণের জন্য চাই আরও ব্যাপক মিডিয়া কাউন্সিলিং।

২. চাই গাড়ির মালিকদের সচেতনতা।

৩. চাই ড্রাইভারদের জন্য কর্মশালা!

৪. অডিও ভিডিও, প্রেজেন্টেশন।

৫. ব্যাপক প্রচারণা।

৬. নিয়মিত গাড়ির হর্ন চেকআপ,

৭. ফিটনেস পরীক্ষাকে দুর্নীতি মুক্ত করা।

৮. সরকারের করণীয়: গাড়ীর পার্টস বিক্রির দোকানগুলোতে তল্লাশি, আমদানির সময় মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া... তার অতিরিক্ত মাত্রার হর্ন জব্দ করা। হাইওয়ে কারের জন্য অনুমোদন সাপেক্ষে তা ব্যবহার। আবার শহরাঞ্চলে তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ। যানজটেই হোক বা সাধারণ চলমান সময়ে কম হর্ন ব্যবহারের উৎসাহ, প্রণোদনা, রাজনৈতিক সভা সমাবেশে মাইক ব্যবহারের লাগাম। সর্বোপরি ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি।

তত্ত্ব ও তথ্যগত দিক ছাড়াও আমাদের মানসিক গ্রহণ বর্জনের ইচ্ছাও প্রভাবক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ

এ তো গেল তত্ত্ব এবং তথ্যগত দিক। এই বাইরে যেটা আমরা অনুভব করি আমাদের মানসিক গ্রহণ বর্জনের

ইচ্ছাও প্রভাবক হিসাবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন কেউ যখন কনসার্টে যায় মনকে তৈরি করেই নিয়ে যায় বিশাল শব্দ তরঙ্গে ভাসবে বলে- তখন শব্দটা আর তার জন্য পীড়াদায়ক হয় না। অথচ একই সময় তা অন্যের জন্য তেমনি হতে পারে। অনুষ্ঠানে, আতশ উৎসবে তারা বিরক্তির বদলে আনন্দ অনুভব করে। আমাদের গ্রহণ বর্জনের মাত্রাটা তখনকার জন্য বদলে যায়। যার জন্য তা সকলকে পীড়া না দিয়ে কাউকে কাউকে আনন্দ দেয়।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ: সমাধান ও করণীয়

বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও মানসিক বিকাশের কেন্দ্র। এখানে প্রতিটি মুহূর্তই শিক্ষার্থীর মনোযোগ, সৃজনশীলতা ও মানসিক প্রশান্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু অতিরিক্ত মাইক, ঢোল, লাউডস্পিকার কিংবা যানবাহনের হর্ন – এসব শব্দদূষণ শুধু শিক্ষার পরিবেশকেই ব্যাহত করে না, বরং শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ এখন সময়ের দাবি।

রাবির বিভিন্ন হলের আশেপাশে বিশেষ করে, কেন্দ্রীয় ফুটবল মাঠ, আবাসিক হলের ছাদ এবং হলের সামনের ক্রিকেট মাঠে উচ্চশব্দে সাউন্ডবক্স বাজিয়ে বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। এদিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, দিবস বা স্নাতক সম্পন্ন উপলক্ষ্যে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, অ্যাকাডেমিক ভবন ও আবাসিক হলসমূহে চলমান ক্লাস ও পরীক্ষার শিক্ষার্থীরা সমস্যার সম্মুখীন হন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া প্রতিনিয়ত শব্দ দূষণের ফলে শুধু হল নয়, লাইব্রেরি ও একাডেমিক ভবনগুলোর পড়ালেখার সার্বিক পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে। দিনের বেলার মতো মধ্যরাত পর্যন্ত আবার কখনো কখনো সারারাত লাগাতার উচ্চস্বরে সাউন্ডবক্স এবং চিল্লাচিল্লি করার কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও ঘুমে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে। এতে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনাসহ দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে বলে জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শব্দদূষণ প্রতিরোধের উপায়

- হাইড্রোলিক হর্ন ও অতিরিক্ত মাইক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
- লাইব্রেরি, পরীক্ষা কেন্দ্র ও আবাসিক হলের আশেপাশে 'শান্ত এলাকা' ঘোষণা করা।
- শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- প্রবীণ শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য শ্রবণ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

অ্যাকাডেমিক পরিবেশ রক্ষায় করণীয়

অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠান আয়োজন: লাইব্রেরি বা অ্যাকাডেমিক ভবনের সামনে বিভাগীয় অনুষ্ঠান, পুনর্মিলনী বা সাংস্কৃতিক আয়োজন বন্ধ করে সেগুলোকে কাজী নজরুল অডিটোরিয়ামে স্থানান্তর করা উচিত। এতে শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকবে এবং অনুষ্ঠানও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।

- **যানবাহন নিয়ন্ত্রণ:** ক্যাম্পাসে চলাচলকারী যানবাহনের গতি সীমিত রাখা এবং হর্ন ব্যবহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা জরুরি। বিশেষ করে লাইব্রেরি পদার্থবিজ্ঞান ভবনসহ অ্যাকাডেমিক ভবনসমূহের আশেপাশে নীরব পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।
- **আইনগত বিধিনিষেধ:** বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে মাইক/লাউডস্পিকার ব্যবহারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।
- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** শিক্ষার্থী সংগঠন ও সাংস্কৃতিক দলগুলোকে শব্দদূষণের ক্ষতি সম্পর্কে নিয়মিত সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- **সাইলেন্ট জোন ঘোষণা:** ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, পরীক্ষা কেন্দ্র ও হাসপাতাল এলাকায় 'Silent Zone' ঘোষণা করে শব্দ নিয়ন্ত্রণের নিয়ম কঠোরভাবে মানতে হবে।
- **বিকল্প আয়োজন:** প্রতিবাদ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট মাঠ বা খোলা জায়গায় আয়োজন করা উচিত, যাতে অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত না হয়।

শব্দদূষণ প্রতিরোধে সাধারণ পদক্ষেপ

- হাইড্রোলিক হর্ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।
- হেডফোনে গান শোনার সময় ভলিউম কম রাখা।
- ক্যাম্পাসে সংবেদনশীল জায়গা যেমন স্কুল/কলেজ, আবাসিক এলাকা ও অ্যাকাডেমিক ভবনের আশেপাশে গাড়ির হর্ন ও মাইক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।

পোস্টার বার্তা

- "শিক্ষার আলোয়ে শান্তি চাই, ঢোল-মাইক নয়, নীরবতা চাই।"
- "পরীক্ষার সময় শব্দ নয়, মনোযোগই আমাদের শক্তি।"
- "শব্দ দূষণ কমাও– শিক্ষার মান বাড়াও।"
- "হল-আবাসিকদের ঘুম নষ্ট মানে আগামী দিনের স্বপ্ন নষ্ট।"
- "ক্লাসরুমে জ্ঞান, মাঠে গান – সময় ও স্থান আলাদা করো।"
- "শব্দের অতিরিক্ততা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার শত্রু।"
- "শান্ত ক্যাম্পাস, সুস্থ মন – এটাই আমাদের দাবি।"

শক্তিশালী স্লোগান

- "ঢোল নয়, জ্ঞানের ধ্বনি চাই।"
- "শব্দ কমাও, জ্ঞান বাড়াও।"
- "নীরবতা শিক্ষার শক্তি।"

- “শান্ত ক্যাম্পাসে গড়ে ওঠে সৃজনশীল মন।”
- “শব্দ দূষণ বন্ধ করো – শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করো।”
- “পরীক্ষার সময় মাইক নয়, মনোযোগই সাফল্যের চাবি।”
- “শিক্ষার্থীর ঘুম নষ্ট মানে জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট।”
- “শান্তি চাই, শব্দ নয়।”

৮। উপসংহার - নীরব ক্যাম্পাস, সুস্থ ভবিষ্যৎ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শব্দদূষণ কেবল পরিবেশগত সংকট নয়; এটি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, মনোযোগ ও শিক্ষাগত দক্ষতার জন্য এক ভয়াবহ হুমকি। এই অদৃশ্য ‘শব্দসন্ত্রাস’ নীরবে আমাদের ভবিষ্যৎকে ক্ষতিগস্ত করছে। তাই শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব হবে নিজেদের পরিবেশে শব্দদূষণ কমাতে সক্রিয় ভূমিকা রাখা এবং সমাজকে এই নীরব ঘাতকের বিরুদ্ধে জাগ্রত করা।

বাংলাদেশ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নীরব এলাকা ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এর কার্যকর প্রয়োগ নেই। অথচ জনস্বাস্থ্যবিদরা স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন– অতিরিক্ত শব্দে শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এমনকি স্থায়ী বধিরতার ঝুঁকিও তৈরি হয়। শব্দদূষণ শুধু পড়াশোনার পরিবেশকে ব্যাহত করে না; এটি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, সৃজনশীলতা ও মানসিক সুস্থতাকে ধ্বংস করে দেয়।

শান্ত ক্যাম্পাস মানে কেবল নীরবতা নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্ঞান, স্বাস্থ্য ও স্বপ্নকে সুরক্ষিত রাখা। তাই এখনই প্রয়োজন কার্যকর আইন প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের সমন্বয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নীরব পরিবেশ নিশ্চিত করাই হবে শিক্ষার্থীদের সুস্থ জীবন ও আলোকিত ভবিষ্যতের প্রথম পদক্ষেপ।

করণীয়

- বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নীরব এলাকা নিশ্চিত করতে হবে– বিশেষ করে লাইব্রেরি, পরীক্ষার হল ও আবাসিক এলাকায়।
- ক্যাম্পাসে লাইব্রেরি, অ্যাকাডেমিক ভবন ও অন্যান্য ভবনের সামনে পিছনে খোলা মাঠে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না। **এর পরিবর্তে বিভাগীয় সমাবেশ, সম্মেলন, গান বাজনার আসর, ছাত্রদের অনুষ্ঠান সবকিছুই বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে সর্বনিম্ন ফি প্রদান সাপেক্ষে করা যাবে।**
- শিক্ষার্থীদের সচেতন হতে হবে, অযথা মাইক ব্যবহার বা হর্ন বাজানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অনুমতি ছাড়া উচ্চ শব্দে মাইক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
- আইন প্রয়োগ ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ছাড়া এই নীরব ঘাতককে প্রতিহত করা সম্ভব নয়।

শব্দদূষণ শুধু পড়াশোনার পরিবেশকে ব্যাহত করে না; এটি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, সৃজনশীলতা ও মানসিক সুস্থতাকে ধ্বংস করে দেয়। শান্ত ক্যাম্পাস মানে শুধু নীরবতা নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্ঞান, স্বাস্থ্য ও স্বপ্নকে সুরক্ষিত রাখা। তাই এখনই জারুরি – কার্যকর আইন প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের সমন্বয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নীরব পরিবেশ নিশ্চিত করাই হবে শিক্ষার্থীদের সুস্থ জীবন ও আলোকিত ভবিষ্যতের প্রথম পদক্ষেপ।

পরিশিষ্ট

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২৫- সারাংশ

- **১. ভূমিকা**
- বাংলাদেশে শব্দদূষণ একটি গুরুতর পরিবেশগত সমস্যা। যানবাহনের হর্ন, মাইক, সাউন্ড সিস্টেম, শিল্পকারখানার যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত শব্দ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। এ কারণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০২৫ সালের নতুন বিধিমালা জারি করেছে। এর মাধ্যমে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনগত কাঠামো আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।
- **২. শব্দমাত্রার সীমা**
- বিধিমালায় বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য আলাদা শব্দমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:
- আবাসিক এলাকা: দিনে সর্বোচ্চ ৫০ ডেসিবেল, রাতে ৪০ ডেসিবেল।
- বাণিজ্যিক এলাকা: দিনে ৬০ ডেসিবেল, রাতে ৫০ ডেসিবেল।
- শিল্প এলাকা: দিনে ৭৫ ডেসিবেল, রাতে ৭০ ডেসিবেল।
- সংবেদনশীল এলাকা (হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত): আরও কঠোর সীমা প্রযোজ্য।
- এভাবে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য আলাদা সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে মানুষের স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি বজায় থাকে।
- **৩. নিষিদ্ধ কার্যক্রম**
- বিধিমালায় কিছু কার্যক্রম স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে:
- অনুমতি ছাড়া মাইক, হর্ন, সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে না।
- নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে উচ্চ শব্দ বাজানো যাবে না।
- জনসমাগমস্থলে অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টি করা যাবে না।
- হাসপাতাল, স্কুল/বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত সংলগ্ন এলাকায় শব্দ উৎপাদন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে।
- **৪. অনুমোদন ব্যবস্থা**
- বিশেষ অনুষ্ঠান, ধর্মীয় কার্যক্রম বা সামাজিক আয়োজনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি নিতে হবে।
- স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।
- **৫. জনসচেতনতা কর্মসূচি**
- বিধিমালায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে:
- লিফলেট, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড বিতরণ করে শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হবে।
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।
- গণমাধ্যমে প্রচার করে জনসাধারণকে নিয়ম মানতে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

৬. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

বিধিমালা ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তি প্রযোজ্য হবে।
এটি কয়েক ধাপে ভাগ করা হয়েছে:

ক. প্রথমবার অপরাধে
- মৌখিক বা লিখিত সতর্কীকরণ।
- জরিমানার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা।

খ. পুনরাবৃত্তি অপরাধে
- জরিমানার পরিমাণ সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা।
- অপরাধে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (মাইক, সাউন্ড সিস্টেম, হর্ন) জব্দ করা হবে।

গ. গুরুতর অপরাধে
- জনস্বাস্থ্য বা জননিরাপত্তার ক্ষতি হলে মামলা দায়ের করা হবে।
- আদালতের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে।
- জরিমানা ও কারাদণ্ড একসাথে হতে পারে।

ঘ. প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের ক্ষেত্রে
- অনুমতি ছাড়া অনুষ্ঠান করলে প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স বাতিল বা কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।
- দায়ী কর্তৃপক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে জরিমানা ও শাস্তির আওতায় আনা হবে।

৭. বিধিমালার উদ্দেশ্য

এই বিধিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো:
- জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা।
- শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবেশ বজায় রাখা।
- হাসপাতাল ও আদালতের শান্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- সামাজিক অনুষ্ঠান ও জনসমাগমে শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

৮. সম্ভাব্য প্রভাব

এই বিধিমালা কার্যকর হলে-
- শহর, গ্রাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শব্দদূষণ কমবে।
- মানুষের মানসিক শান্তি বাড়বে।
- শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হবে।
- জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা পাবে।

৯. উপসংহার

"শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২৫" বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি শুধু আইনগত কাঠামো নয়, বরং জনসচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার একটি মাধ্যম। যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তবে এটি মানুষের জীবনমান উন্নত হবে এবং একটি স্বাস্থ্যকর সমাজ গড়ে তুলবে।

বাড়বে জেল-জরিমানা

'শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬' অনুযায়ী, সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল এক মাসের জেল বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ড। খসড়া বিধিমালা অনুযায়ী, এ শাস্তি সর্বোচ্চ দুই বছরের জেল বা দুই লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড

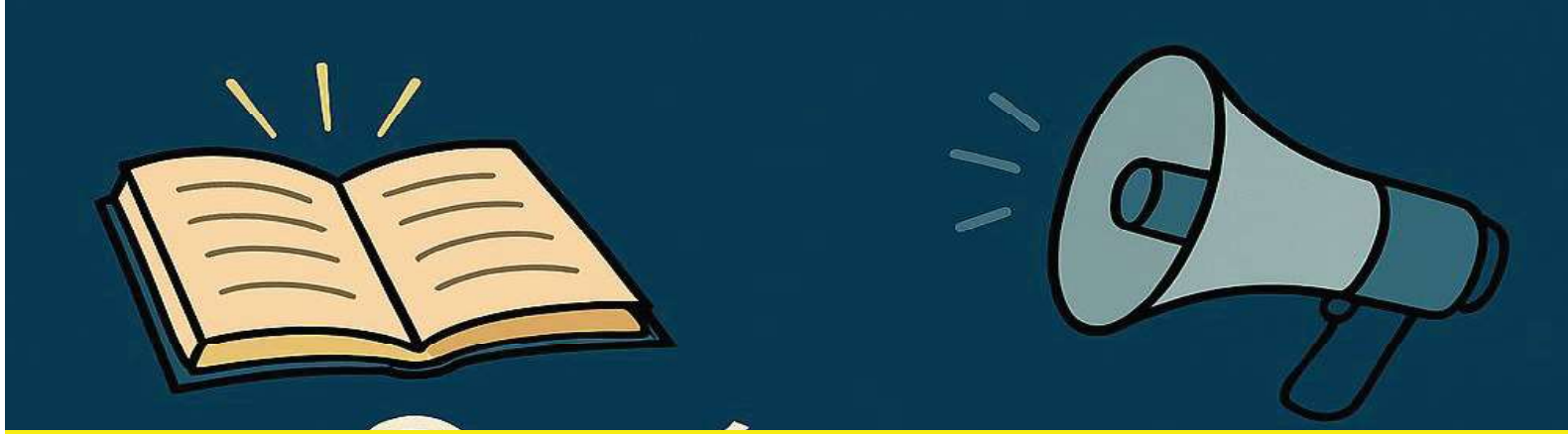

রাবির শান্তিপূর্ণ ক্যাম্পাস, স্বাস্থ্য ও একাডেমিক পরিবেশ- এটাই আমাদের দাবি

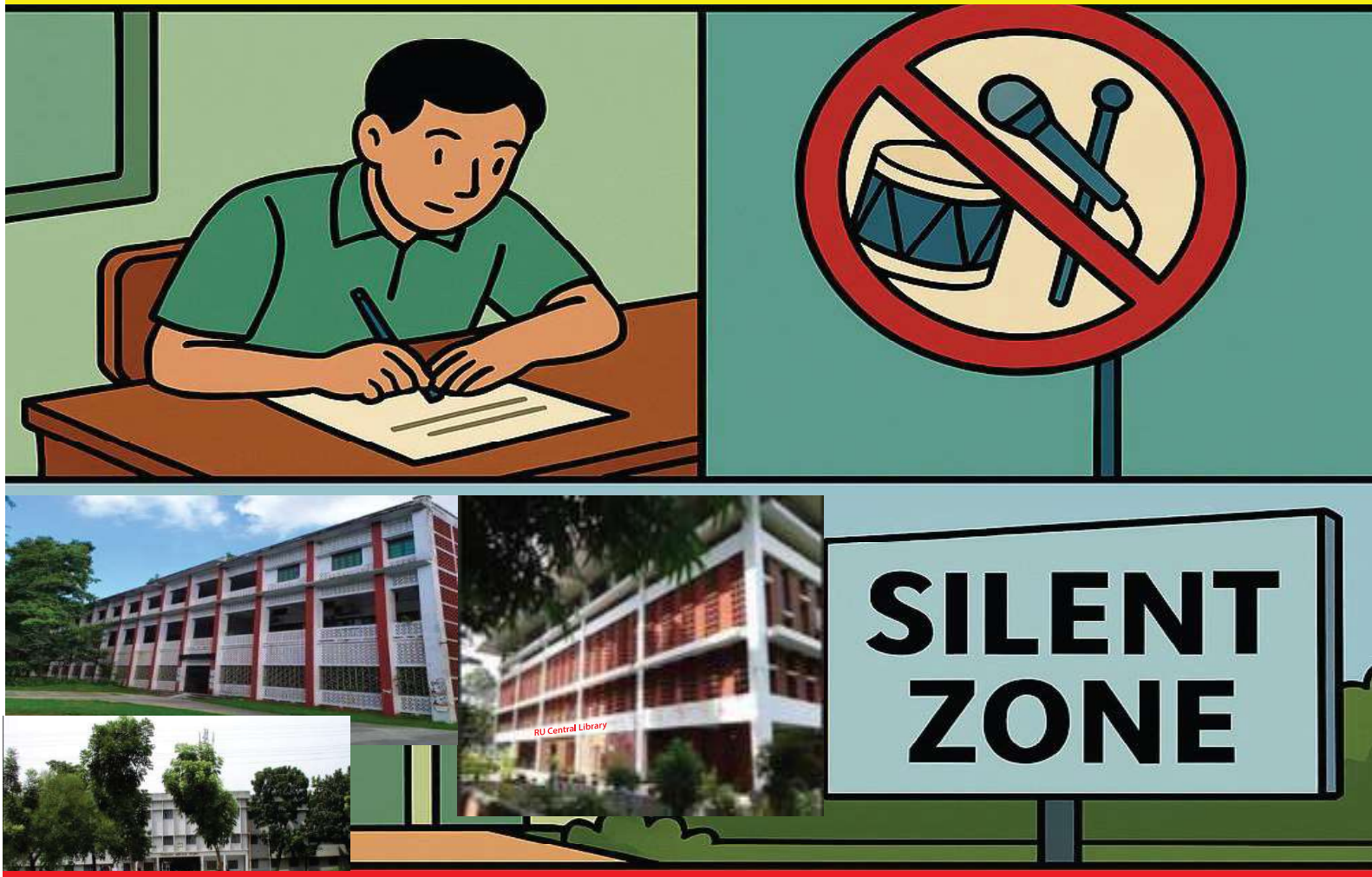

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়